# সেকুলারিজ্‌ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা

দেবী প্রসাদ রায়



স্বাধীন ভারত যাত্রা শু করেছিল ১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধানের উদ্দেশিকা অনুযায়ী স্বাধীন, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে যে রাষ্ট্র তার সব নাগরিকের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় নিশ্চিত করবে, চিন্তা ঝিাস ও ধর্মাচারণের স্বাধীনতা প্রদান করবে এবং আত্মমর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যকে নিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের পথ অনুসরণ করবে। সেকুলারিজম্-এর কোন কথা তখন সংবিধানে ছিল না। ছাবিবশ বছর পর বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সোভারিনিটি (সার্বভৌমত্ব)-র পরই 'সেকুলার' এবং 'সোস্যালিস্ট' শব্দদুটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন এই সংযোজন হ'ল তার কোন গ্রহণীয় বিশদ ব্যাখ্যা বা বক্তব্য পাওয়া যায় না। বস্তুত পক্ষে প্রাথমিক উদ্দেশিক ার ব্যাখ্যায় প্রশাসন ও ধর্মচারণ সম্পর্কের কথা বলা হ'য়েছে যথেষ্টভাবে — ছাবিবশ বছর পরে 'সেকুলার' শব্দটির সংযুক্তি উদ্দেশিকাকে সুস্পষ্ট অর্থবোধক কোন নতুনতর মাত্রা দিতে পারে নি বরং অভিজ্ঞতা বলছে অভাবিত এক বিভ্রা ন্তির অবকাশ সৃষ্টি ক'রেছে। 'সোস্যালিস্ট' শব্দটির অনুপ্রবেশও সমান্তরাল অর্থনৈতিক আদর্শের অনুল্লেখে অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে থেকে গেছে। যে সময়ে শব্দ দুটি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে তার সংগে বর্তমান কালের ঝি পরিস্থিতির তুলনা করলে ঐ সংযোজনের তৎকালীন যান্ত্রিকতা ও দু র-ভবিষ্যৎব্যাপী-উদ্দেশ্যহীনতাই প্রকটিত হয়, বিশেষ ক'রে সোভিয়েট রাশিয়ার বিলুপ্তিতে এবং পূর্বইউরোপীয় দেশগুলিতে সোস্যালিজমের দূরবস্থার নিরিখে। অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ব'লে ঐ শব্দদুটিকে বর্জন করার দাবীও একেবারে অযৌক্তিক তা মনে হয় না।

দেখা যাক, 'সেকুলার' শব্দটির সংযোজন কতটা অর্থবহ বা তাৎপর্যপূর্ণ হ'তে পেরেছে আমাদের জাতীয় জীবনে।

'সেকুলার' শব্দটি বিদেশী ভাষা লাটিন Seculum থেকে নেওয়া। খৃষ্টীয় পরিভাষায় এর অর্থ হ'ল — যা চার্চ সংক্রান্ত নয় বা যাজকীয় নয় — Non-ecclesiastical বা Non religious বা Non-Sacred (অপবিত্র) Profane রোমান ক্য াথলিক চার্চের ধর্ম-যাজকদের ভ্রষ্টাচারে ইউরোপের সাধারণ মানুষ যখন উৎপীড়িত, ক্লিষ্ট এবং হতাশাগ্রস্ত তখন চার্চের প্রভাবের বিদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনই রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে Non-ecclesiastical (Secular) সেকুলার রাষ্ট্র চিন্তার উদ্ভব ঘটায় যা প্রথম দিকে যতটা না ঈশ্বর-বিরোধী ছিল তার চাইতে অনেক বেশী ছিল চার্চবিরোধী। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজচিন্তায় এই চার্চবিরোধী মানসিকতা শেষাবধি ঈশ্বর-নিরপেক্ষতায় বা ঈশ্বরবিরোধীতায় উত্তীর্ণ হ'য়ে 'Secular' শব্দটিকে একটি রেঁনেশাঁধর্মী মহিমা প্রদান করে। ইতালীতে মেকিয়াভেল্লিই প্রথম রাজনীতিকে ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রের অ ানুগত্য থেকে মুক্ত করা প্রয়াস পান। সেকুলার বা ধর্মহীন রাষ্ট্রনীতির জন্ম এভাবেই হয় ইউরোপে। কিন্তু এই 'সেকুলার' রাষ্ট্রনীতি সুস্পষ্ট এক অবয়ব পেতে সময় নিয়েছিল বহুমুখী আন্দোলন সমৃদ্ধ প্রায় দুইশতাধিক বছর। সেকুলার রাষ্ট্রদর্শ অনুযায়ী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে তাদের সুখ শান্তি নিরাপত্তা ও জাগতিক উন্নতির জন্য, সমাজকে ধারণ ক'রে রাখে ধর্ম নয় — মানুষ রচিত বিধিবিধান ও নীতি — ঈশ্বরের অস্তিত্বই অনাবশ্যক, অযৌক্তিক। চিন্তার পথ যুক্তির পথ, যুক্তির পথ বিজ্ঞানের পথ, বিজ্ঞানের পথই কল্যাণের পথ, চিন্তা করতে সক্ষম, সমস্ত জীবজগতের মধ্যে একমাত্র ম ানুষ। মানুষই সব, সুতরাং ঈশ্বর বা ধর্ম অপ্রাসংগিক, সেকুলার চিন্তার এই হ'ল মূলমন্ত্র, এই হ'ল ভিত্তি। বাস্তু বিজ্ঞ

ানভিত্তিক এই রাষ্ট্রাদর্শ, ধর্মকেন্দ্রিক সংঘর্ষ যুদ্ধ খুনোখুনী-ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে একশো ভাগই গ্রহণীয়। কিন্তু আজ বিজ্ঞান প্রযুক্তির অতি দ্রুত এবং অভাবিত উন্নতির যুগেও ধর্ম নিয়ে সংঘাত, বিশেষ বিশেষ ধর্মের অধীনে সমগ্র বিশ্বকে আনার প্রাতিষ্ঠানিক সুকৌশলী প্রয়াস, রক্তক্ষয়ী প্রয়াসও এখনো বিদ্যমান কেন? তাহ'লে কি সেকুলার রাষ্ট্রচিন্তায় অথবা তার রূপায়ণ প্রয়াসে কোন দুর্বল দিক থেকে গেছে? এ প্রশ্নটি আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গবেষণার বিষয় হওয়া উচিৎ। এ'কথা প্রায় অনস্বীকার্য যে সেকুলার রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভবের পথ ছিল সঠিক কিন্তু সে চিন্তার বাস্তবায়ন এবং ব্যাপকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিবর্তনের ইতিহাসে মানব প্রজাতির মানসিকতার বর্তমান অবস্থানের ধর্ম ও ঈশ্বরচিন্তার প্রভাবের মাত্রার মূল্যায়ণ হয় নি ঠিক মত। যে ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্যের সাথে মানুষের অন্তর্লোকে বিপ্লব ঘটানোর দরকার ছিল তা হ'তে পারে নি। মানবপ্রজাতির উপর ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রভাবের কথা চিন্তা ক'রেই সম্ভবতঃ জনলক, ভল্টেয়ার, মন্টেস্কু, ডি এলামবার্ট, শো প্রমুখেরা ধর্মহীনতার চাইতে পরমধর্মসহিষ্ণুতার উপর জোর দিয়েছিলেন। স্বয়ং লেনিনও মার্ক্সীয় আদর্শ গ্রহণ ও তার রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েও বাস্তবতার বিচারে সেকুলার বা ধর্মহীনতার প্রবক্তা হন নি অন্ততঃ তাঁর ১৯০৫ সালের বক্তব্যে তাই মনে হয়। রাশিয়ায় জারের কাছে বিপ্লবীদের পেশ করা দাবীগুলির প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন / The State must not concern itself with religion; religious Societies must not be connected with the State powers. Every one should be absolutely free to profess whatever religion he prefers or recognise no religion ………. There must be no discrimination whatever in the rights of citizens on religious grounds ……… no state grants must be made to ecclesiastic and religious Societies which must become absolutely independent, voluntary associations of like minded citizens.* বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিনের মৃত্যুর আগেই ধর্ম বা ধর্মাচরণ-সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধের পরিকাঠামো তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল। নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনের পর স্ট্যালিনের নির্দেশে ১৯২৯ সালে গঠিত হ'ল 'The League of militants Godless.' ঈশ্বরহীনতা প্রচারের জন্য স্লোগান চালু হ'ল 'The fight for godlessness is a fight for socialism.' কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিপুল উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্তরের মানুষের এমন কি দলীয় উচ্চ স্তরের মানুষের মনের গভীর থেকে ধর্মের অস্তিত্ব মুছে গেল — এমনটা হ'ল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সংগে সংগেই বহু নিন্দিত, সমালোচিত জাতীয়তাবাদ তথা স্বদেশভক্তিকে স্থান দিতে হ'ল এবং ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কঠোরতাকে অনেকাংশে শিথিল করতে হ'ল। অর্থাৎ এত তাড়াতাড়ি ধর্মবিহীন বস্তুবিজ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠন করা যাবে না — এ সত্য প্রকটিত হ'ল এবং হ'তে থাকলো। ১৯৫৩ সালের মে মাসে অর্থাৎ স্ট্যালিনের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে কট্টর মার্ক্সবাদীদের প্রবক্তা সেলপিন(komosomol -এর প্রথম সেক্রেটারী) জানান্ দিলেন / War against religious prejudice is an integral part of the fight for the communist education of the working class, for the education of active and conscientious builders of communism free of any and all links to the past.* ষাটের দশকে দেখা গেল 'fight for godlessness' অতি দ্রুত ক্ষীয়মান পরিসংখ্যান বলছে শিশুদের মধ্যে ৬০ শতাংশকে চার্চ 'ব্যাপ্‌টাইজ্' করেছে — ১৫ শতাংশ বিবাহ এবং ৩০ শতাংশ মৃত্যু-অনুষ্ঠান চার্চ মতোই সম্পন্ন করা হ'য়েছে। কট্টরপন্থীরা তথ্য পেল ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসীদের ৭০ শতাংশই চল্লিশ বয়োসোর্ধ্ব, মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশ যে মহিলারা তাদের ৭০শতাংশ ঈশ্বরবিশ্বাসী। শত চেষ্টা সত্ত্বেও পারিবারিক স্তর থেকে ধর্মাচারণকে ধর্ম বিশ্বাসকে হঠানো গেল না। আর আজ গ্লাসনস্ত, পেরস্ত্রৈইকা পেরিয়ে এসে ভেঙ্গে যাওয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের রাশিয়াতে ধর্ম ফিরে এসেছে বিপুলভাবে লেনিনগ্রাড্ শহরের নাম হ'য়েছে সেন্ট পিটার্সবার্গ।

সেকুলার বা ধর্মহীনতা-দর্শনের এই ঐতিহাসিক পরিণতি প্রত্যক্ষ ক'রেও কেন 'সেকুলার' শব্দটি ভারতীয় সংবিধানে ঢুকে পড়লো — এটি আশ্চর্যের বিষয়। পণ্ডিত নেহরু ছাড়া আমাদের সংবিধান প্রণেতারা কেউই 'সেকুলার' শব্দটিকে আমলই দেননি — সংবিধানের আদি উদ্দেশিকায় স্পষ্ট হয়েই আছে। বস্তুতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরধর্মসহিষ্ণুতার কথাই প্রকারান্তরে স্থান পেয়েছিল। নেহরুর অভিলাষ পূরণের জন্যই অথবা রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ মোতাবেক মার্ক্সবাদীদের খুশী করার জন্যই এবং সেই সঙ্গে তথাকথিত প্রগতিশীলতা তুলে ধরতেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৪২-তম সংশোধন ঘটিয়ে 'সেকুলার' শব্দটি ঢুকিয়ে ছিলেন কিনা তা অবশ্যই চর্চার দাবী রাখতে পারে।

সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত নেহ ছাড়া আর সবাই উদ্দেশিকায় সন্নিবেশিত প্রতিশ্রুতির মধ্যেই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহিষ্ণুতাকে গুত্ব দিয়েছিলেন — অবাস্তব ব'লেই সম্ভবত ধর্মহীনতা বা সেকুলারিজ্মকে গুত্ব দেন নি। ৪২-তম সংশোধনে 'সেকুলার' শব্দটি যোগ করার পর ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মসহিষ্ণুতা এবং ধর্মহীনতার এক বিচিত্র সমাবেশ রাজনৈতিক নেতাদের হাতে সংবিধানকে ইচ্ছামত ভাষ্যপ্রদান করার এক অস্ত্র তুলে দিল। সংবিধানের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সংগে সংগতিহীন সামঞ্জস্য-হীন বহু ঘটনা ঘটতে লাগলো। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত এইবার প্রাসংগিকতার মধ্যে এসে যাচ্ছে।

১৯৪৯ সালে বাবরি মসজিদে রামলালার মূর্ত্তির অনুপ্রবেশ, সোমনাথ মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটনে রাষ্ট্রীয় প্রধানদের সংযুক্তি, হিন্দু কোডবিল পাশ — রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে — আইনের সাম্যকে অর্থহীন ক'রে তুলে মুসলীম পার্সোন্যাল ল'-এর সংরক্ষণ — শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কে রাজনৈতিক স্বার্থে বানচাল করা — এ'সবই সেকুলারিজমের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দ্বিচারিতা মাত্র। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন রীতি নীতি থাকতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতি ও কল্যাণের স্বার্থে কোন ধর্মের কোন প্রতিবন্ধকতা মানা হবে না এটাই ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্র এই অর্থেই ধর্মের উর্দ্ধে থাকবে, রাষ্ট্রীয় পরিচয়টাই মুখ্য হবে — ধর্মীয় পরিচয় হবে গৌণ। কিন্তু খুবই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় এবং উদ্বেগের বিষয়ও এই যে ভারতীয় নাগরিকের একটি অংশ প্রথম পরিচয় হিসেবে ধর্মকেই মুখ্য মনে করে — ভারতীয়তাকে গৌণ মনে করে। এটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাতের তুল্য, কারণ প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশের সংঘাত অনিবার্য। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবহমান সংঘর্ষের মূল কারণ এটাই। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যাথা নেই — এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে এটাই আব্ছা করে দিচ্ছে আর এই আলো-আঁধারীকেই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারে আগ্রহী রাজনৈতিক নেতারা। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বার্থে কিছু রাজনৈতিক দল তথা নেতা কখনো সেকুলারিজমকে তুলে ধরে কখনো বা ধর্মনিরপেক্ষতার ধূয়ো তুলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আশা আকাঙ্খা ভাবাবেগকে তুচ্ছ ক'রে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় উগ্রতাকে পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দিতে থাকলো — রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থকে বলি দিয়েও একাজ চলতে থাকলো। সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষজন দেখেছে উদ্বেগের সংগে, কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যগুলিতেও বহিরাগত মুসলীমরা রাজ্যের জনচিত্রের চরিত্র পাল্টে দিয়েছে, দিচ্ছে, বিশেষ করে আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভয়াবহ। বহিরাগত মুসলীমরা যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই এখানে ঢুকতে বাধ্য হ'য়েছে এমন সরলীকৃত ব্যাখ্যা যে প্রযোজ্য নয় পরিকল্পিত ভাবে জনচিত্র পাল্টানোর ব্যাপারটিও আছে যার সংগে প্যান ইস্লামিক জগতের বৃহত্তর স্বার্থ এবং বৈরী পাকিস্তানের কূট অভিসন্ধিও জড়িত — এটি একটি নির্মম এবং অতি বাস্তব সত্য। আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'য়েছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতেও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি বালিতে মুখ গুঁজে এসব না দেখার ভান ক'রে এসেছে এবং এখনও করছে। ঐ ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে, সেকুলারিজমের নামে না হ'লে বহিরাগতরা অতি দ্রুত রেশন কার্ড পেয়ে স্বল্প আয়াস এবং অনায়াসে ভারতীয় নাগরিকত্বও অর্জন করতে পারছে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে কি করে? সংখ্যালঘু-ভোট ব্যাংক গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দলগুলির এই যে দ্বিচারিতা ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমের নামাবলীর আড়ালে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ আজ ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছে এবং নিজেরাই তার প্রতিকার কল্পে ব্যবস্থা নিতে শু ক'রেছে তাদের সীমাবদ্ধ চিন্তানুযায়ী।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন দেখেছে কীরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত উৎখাত হ'য়ে আশ্রয় শিবিরে বাস করছে এবং সেকুলারিজমের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বিকার থেকেছে আবার গুজরাটের সাম্প্রতিক দাংগায় হাজার হাজার মুসলিমদের আশ্রয় শিবিরে যেতে হ'য়েছে দেখে ঐ রাজনৈতিক দলগুলিই সোচ্চার হ'য়েছে ঐ সেকুলারিজম'-র জন্যই — কীরে বেছে বেছে হিন্দু গণহত্যায়, মন্দিরের হিন্দু পুরোহিতদের শিরছেদে যারা নির্বাক থেকেছে, গোধরায় করসেবকদের পুড়িয়ে মারায় যারা নির্লিপ্ত থেকেছে — বাংলা দেশে হাজার হাজার মা-বোনেরা লুণ্ঠিতা ও ধর্ষিতা হচ্ছে

জেনেও যারা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন ক'রছে 'সেকুলারিজমের' স্বার্থে তারাই আবার মার্কিন বোমায় বিধবস্ত আফগানদের জন্য প্রতিবাদ মিছিল করছে, গুজরাটের ঘটনাবলীর জন্য প্রতিবাদের ঝড় তুলছে — এগুলি কি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু নয়? গুজরাটে নাকি 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' চলছে। বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী-সন্ন্যাসীদের পুড়িয়ে মারা-নানুরের হত্যা, ছোট আঙারিয়ার হত্যাকাণ্ড — এরকম আরো আরো ঘটনা-এগুলি কি 'প্রগতিশীল সন্ত্রাস' বলে উপভোগ্য? সেকুলারিজম, ধর্মনিরপেক্ষতার ও মানবতাবোধের এই সব 'ন্যক্কার-জনক' উদাহরণ বৃহত্তর জনসমাজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদের ধবংস সাধন এবং ২০০২ সালের গুজরাটের দাংগার চরিত্র তার উদ্বেগজনক পরিণাম। স্বার্থান্ধে বিকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা, সেকুলারিজম্ এবং মানবতাবোধ' থেকে সাধারণ মানুষ নিষ্কৃতি পেতে চাইছে তার স্তরের ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী।

কিন্তু কেন এমন হ'ল? আমরা কি 'সেকুলারিজম' অনুসরণ করার অযোগ্য? ধর্মনিরপেক্ষতার মানে বুঝতে কি অপারগ?

আসলে খুব ভাল ক'রে বিশ্লেষণ করলে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আমাদের দেশে জনজীবনের 'ধর্মহীনতা' বা 'সেকুলারিজম' একেবারেই অপ্রযোজ্য — ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরধর্মসহিষ্ণুতার তবুও একটা আবেদন আছে। সেকুলারিজম বা ধর্মহীনতা অপ্রযোজ্য — তার কারণ এটিকে কৃত্রিমভাবে এবং অনুপযুক্ত সময়ে সংবিধানে ঢোকানো হয়েছে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সেকুলার রাষ্ট্রাদর্শকে প্রগতিশীলতার প্রতীক হিসেবে সামনে রেখে। ইউরোপে সুদীর্ঘ দুই শতক ধরে সেকুলারিজম-এর আন্দোলন চ'লেছে বহু উত্থানপতন অতিক্রম করে এর যথার্থতা জনসাধারণ স্বীকার ক'রেছে। এই স্বীকৃতির অনুকূল একটা বাতাবরণও ছিল। সেটি হ'ল সেখানের জীবনচর্যা অনেকাংশে বস্তুবিজ্ঞান আধারিত। কিন্তু আমাদের দেশের জীবনচর্যা প্রধানতঃ আধ্যাত্মবিজ্ঞান বা দর্শন আধারিত এবং বহু প্রাচীন কাল থেকে, যে কালে ইউরোপীয় সভ্যতার উদ্ভবই ঘটেনি। সুতরাং শিল্প বিপ্লবের পর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঘাত্ এসে পড়লেও প্রায় সাত হাজার বছর ধরে অনুশীলিত দর্শন, ভুল হোক আর ঠিকই হোক, হঠাৎ করে শূন্যে বিলীন হ'তে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী যে আন্দোলন অনুশীলিত দর্শনকে পর্য্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন করতে পারতো সে আন্দোলনই হয়নি। নেহরুই সমকালীন এবং এদেশে সেকুলার চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠপ্রবক্তা এম. এন. রাও এ আন্দোলন করতে পারেন নি — সীমিত ভাবে কয়েকজন চিন্তাবিদ্দের মধ্যেই এটা সীমিত ছিল। সুতরাং অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যেমন একজন নেহ, চাইলেই জনসাধারণ এবং সব নেতারা সেকুলার হয়ে যাবেন তাতো হয় না। যারা 'সেকুলার' হয়ে যান সময় বিশেষে তারা প্রকৃত অর্থে কতটা সেকুলার? সেকুলার এক রাজনৈতিক দলের নেতা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী 'শাহবানু'দের চোখের জল মোছাতে পশ্চাৎপদ হলেন কেন? সেকুলার অপর এক 'প্রগতিশীল' রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময়ে ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের প্রধানের কাছে ভিখারী হয় কেন? যাদের দর্শন তাদের প্রশাসন দক্ষিণ বংগে 'বনবিবি'র উৎসবে মেতে ওঠেন কোন্ 'সেকুলার' আদর্শের তাড়নায়? ধর্মের বিপন্নগামীতা বা ভ্রষ্টাচার থেকে মুক্ত হ'য়ে 'সেকুলারিজমের' ভণ্ডামীর খপ্পরে পড়া এটাই কি কাম্য ছিল? এ যেন অথবা টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস!

এই বিকৃত সেকুলারিজম পক্ষপাতপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যই স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও জাতীয় সংহতি বোধ, ভারতীয়বোধ এক প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণ এবং মুখ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলীম জনসাধারণ উভয়েই বিপুল ক্ষতি এবং ক্ষতচিহ্ নিয়েপারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ নিয়ে আজ মুখোমুখী। জাতীয় স্বার্থে এই অবস্থার সদর্থক পরিবর্তন দরকার, প্রতিকার দরকার — দরকার পারস্পরিক কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের সুস্থ পরিবেশ তৈরী করা। এ কাজ বর্তমানে কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মানসিকতা বুঝতে হবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অন্যদিকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা বুঝতে হবে সংখ্যাগু হিন্দুদের। সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ভাবে ধর্মীয় কারণে দাংগার মাধ্যমে ভারত ভাগ করার জন্য যে বেদনাবোধ হিন্দুদের আছে এবং তারপরেও ভারতে থেকে যাওয়া মুসলিমদের দিক থেকে যে সহযোগিতামূলক আচরণ

হিন্দুরা প্রত্যাশা করেছিল তা রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থান্ধ আচরণে ও হস্তক্ষেপে ও পাকিস্তানের প্ররোচনায় যে ভাবে বিপথগামী হয়েছে তার অনুধাবন করতে হবে ভারতীয় মুসলিম সমাজকে, অপরদিকে শিক্ষায় অনগ্রসর দারিদ্র্যপীড়িত ও হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত মুসলিম সমাজের যুগোপযোগী সামাজিক পরিবর্তনে প্রগতিশীল মুসলিম ব্যক্তিদের সহযোগিতায় হিন্দু শিক্ষিত সমাজকেও উদ্যোগী হতে হবে। এ কাজ, যেটি সত্যিকারের সংহতি রক্ষা ও বৃদ্ধির কাজ, তা হচ্ছে না — পরন্তু অশিক্ষা ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুসলিম আমজনতার ধর্মীয় বোধে সুড়সুড়ি দিয়ে তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ জন্যই যেখানে হিন্দু সমাজে রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ইত্যাদির উত্থান সম্ভব হয়েছে — মুসলিম সমাজে তা হ'তে পারে নি। এটা সম্ভব করার জন্য মুসলিমদের চাইতে হিন্দুদের দায়িত্ব বেশী — কারণ "পশ্চাতে রেখেছে যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে" — অপর পক্ষে মুসলিম সমাজের আলোকপ্রাপ্ত অংশকে অগ্রণী হ'তে হবে হিন্দু মুসলিম যৌথ উদ্যোগে মুসলিম সমাজে অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য। ইংরাজ স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইংরাজ বিচার ব্যবস্থায় মুসলিমদের প্রাধান্য দিয়েছিল, হিন্দুকে দিয়েছিল রাজস্ব ব্যবস্থার। 'দশশালা' বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর দেখা গেল রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হিন্দুদের আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হ'ল আর সময় মত খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় মুসলিমরা আর্থিক দিক থেকে পংগু হতে থাকলো। কিছুকালের মধ্যেই এক স্পষ্ট আর্থিক পুনর্বিন্যাস সাধিত হ'ল যাতে করে অবস্থা ভাল হওয়া হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হ'ল অন্যদিকে ক্ষুব্ধ, শাসকশ্রেণী থেকে বিচ্যুত মুসলিমরা ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন ক'রে সংকীর্ণ ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ করতে থাকে নিজেদের। ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় নবজাগরণ যা মূলতঃ বাংলাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে তা কার্য্যত হিন্দু নবজাগরণে পরিণত হ'ল। হিন্দু মুসলিম সমাজের মধ্যে এই বৌদ্ধিক পার্থক্য ধীরে ধীরে একটা স্থায়ী রূপ পেতে থাকে — মানসিক দূরত্বও ক্রমবর্দ্ধমান হ'তে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য এবং ঐক্য স্থাপনের জন্য গান্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলন শু করেন — হিন্দু মুসলিম কাছাকাছি আসার একটা সম্ভাবনা দেখা দিলেও শেষ অবধি ওয়াহবি আন্দোলনের প্রভাবে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট তো হ'লই উপরন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের সুবাদে সংগঠিত হওয়া মুসলিম সমাজে ধর্মীয় উগ্রতা ঠাঁই করে নিল, যার প্কাশ দেখা যায় কেরালার মোপালা বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক চরিত্রে — বহু হিন্দুর নিধনে এবং বলপূর্বক ধর্মান্তকরণে। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে শেষ অবধি খুন হ'লেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কিন্তু কেন খিলাফৎ আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন ধর্মীয় উগ্রতায় পর্যবেশিত হ'ল? এটি ব্যাখ্যার জন্য আমাদের যেতে হবে মুসলিম ধর্ম বিস্তৃতির গোড়ার দিকের ইতিহাসে।

হজরত মহম্মদের জীবন দর্শনের দুটি অধ্যায় (১) মক্কার অধ্যায় এবং (২) মদিনার অধ্যায়। মক্কার মহম্মদ সত্যদ্রষ্টা-মানবপ্রেমিক নীতির প্রবক্তা আর মদিনার বিজয়ী বীর ও রাষ্ট্রনায়ক। মুসলিম সমাজ গ'ড়ে উঠেছে মদিনার বিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক মহম্মদের আদর্শে, যেখানে প্রয়োজনীয় ছিল পৌত্তলিক আরব ইহুদিদের নির্মম শত্রুতার বিদ্ধে অন্ধ আনুগত্য ও বিপক্ষের প্রতি সন্দেহশীলতা — এটি ছিল তৎকালীন প্রয়োজনে সাময়িক স্ট্র্যাটেজি — যদিও মুসলিম সমাজে এটাই স্থায়ীত্ব পেয়ে যায়। যেমন মদিনায় অবতীর্ণ একটি সুরার শেষে বলা হয়েছে "হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহর রোষে যারা পতিত হ'য়েছে সেই দলের লোকেদের সংগে বন্ধুত্ব ক'রো না" (৬০ ঃ ১৩) টীকাকার বলেছেনএখানে ইহুদিদের কথাই বলা হ'য়েছে — সমসাময়িক মুসলমানেরা হয়ত এই কথাই ভাল করে বুঝেছিল এবং তাদের অনুবর্ত্তিতায় পরবর্তী মুসলমানেরা হয়ত বুঝে নিয়েছে — যারা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নয় তাদের সংগে বন্ধুত্ব ক'রো না। কিন্তু এটিও সার্বিকভাবে সত্য ছিল না। বিচার বুদ্ধি সমন্বিত সুফী মতবাদ যার প্রবক্তা ছিলেন ইমাম আবুহানিফা, তার প্রভাবও ব্যাপক ছিল। ভারতবর্ষে সুফী মতবাদই প্রাধান্য পাচ্ছিল ধীরে ধীরে। এর প্রমাণ, যে সময়ে গজনীর মাহমুদ হিন্দুমন্দির ধবংস ও ধনরত্ন লুঠ করছিল ঠিক সেই সময়েই আলবিণী বিশেষ শ্রদ্ধায় ও যত্নে হিন্দু জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ ক'রে তাঁর দেশকে সেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ ক'রছিলেন। তবে এ কথাটাই চরম সত্য যে বিচার বিশ্লেষণ ও মধ্যপন্থা বাদ দিয়ে কঠোর ভাবে শাস্ত্রপন্থীরাই (মদিনা) শেষ অবধি ইমাম গাজ্জালী তথা ত্রয়োদশ শতকের শেষে আবির্ভূত ধর্মগু ইবানে ইমাম তায়মিয়ার প্রভাবে মুসলিম সমাজকে গঠন করেন। ভারতে সুফি মতবাদের প্রভাব এক সময় থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তায়মিয়ার ভাবশিষ্য আবদুল ওয়াহবির প্রচেষ্টায় ভারতে সুফী মতবাদের অবলুপ্তি ঘটে। ভারতে ওয়াহবি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করলেই

তা বোঝা যায়। এককালে ভারতকে "দাল হর" বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, পরে "দাল ইসলাম" বলে গ্রহণ করে দ্রুত ইসলামীকরণের উপর সমধিক গুত্ব দেওয়া হয়। অনেক মুসলমান জমিদার ও সাধারণ মানুষ বৃহৎ হিন্দু সমাজের সংস্পর্শের কারণে হিন্দু পূজা পার্বণকে গ্রহণ করেছিলেন বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে। হিন্দু মুসলিম সৌহার্দ্যের একটি সংস্কৃতি রূপ নিচ্ছিল। কিন্তু ওয়াহবি আন্দোলন তাকে ব্যাহত করে এবং ভারতীয়ত্ব নির্মাণে সেটিই এক বাধায় পরিণতি হয় এবং এখন সেই বাধাই মুখ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কট্টরপন্থীদের নিরন্তর প্রয়াসে। — ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের মধ্যেই বিধর্মীদের বিদ্ধে 'জিহাদের' অনুপ্রেরণায় জন্ম নিয়েছে উগ্রপন্থা, গোটা ঝি আজ যে ত্রাসের সম্মুখীন, ভারত তো বটেই। এইরকম জটিল পরিস্থিতি থেকে আমরা কি মুক্তি পাব না ? মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাংগার কবলে পড়াই কি আমাদের ভবিতব্য? এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে 'তত্ত্বজ্ঞান' নয় কিছু কাণ্ডজ্ঞান নিয়েই আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে এবং প্রধানতঃ মুসলিম সমাজকে। এটা কোন পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভংগি ভাবলে ভুল হবে। ৮ মানুষের সংগে সব ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে তুলনা করাটা সমীচিন হয় না — হ'তে পারে না। একজন হিন্দু পাকিস্তানে কেমন আছে, বাংলাদেশে কেমন আছে, তালিবান শাসনাধীন আফগানিস্থানে কেমন ছিল তার তুলনায় একজন মুসলিম ভারতে কেমন আছে — এটা ভাবলেই সঠিক দৃষ্টিভংগির উদ্ভব ঘটবে। কাণ্ডজ্ঞানই দিক্‌নির্দেশক হবে। দাঙ্গা ঘটিয়ে ভারত ভাগ করার পরও পর্যায়ে পর্যায়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে কারা — হিন্দু না মুসলিম? কেন প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলিতে হিন্দু সংখ্যা ক্রমাগত ক'মেছে অথচ ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ব্যাপক ভাবে বেড়েছে এর কারণ হৃদয়ংগম করা দরকার নয় কী? ভারতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দের সংগে সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরী ক'রে থাকার জন্য সংখ্যালঘুদের প্রতি আবেদনকে "ব্ল্যাকমেলিং" বলে চিহিত করতে রাজনৈতিক ধান্দাবাজের অভাব নেই — আপাতঃ গ্রাহ্যযুক্তিও খাড়া করা যায় কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভাবলে এর যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা যায় কি? এ আবেদন অতীতেও করা হয়েছিল। একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৮৩ সালে একটি খৃষ্টান মাইনোরিটি ডেলিগেশনের কাছে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন / …….. Minority can not claim to be safe by constantly irritating the majority* ইন্দিরা গান্ধী কি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কথা বলেছিলেন না বাস্তব অবস্থার দিকে ইংগিত করেছিলেন? শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এই সত্য উপলব্ধি করেন অনেকেই। সাধারণ মুসলিম জনসাধারণও অনেকাংশে তা করে, কিন্তু করতে চায় না রাজনীতি সর্বস্ব মুসলিম নেতারা যাদের ধর্মীয় উস্কানির ফলে উপলব্ধ সত্য অন্তরালেই থেকে যায়। 'Rediscovery of India-র লেখক, সুদীর্ঘকাল U. N. O তে কাজ করার বিপুল অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মানুষ আনসার হেসেন খান তাঁর বইতে লিখেছেন / …….. Mr. Sahabuddin and Mr. M. J. Akbar, leave alone the Imam of the Shahi mosque in Delhi, were barking up the wrong tree ……. They were only leading the community of Indian Muslims astray by legislations ……. Those who took the line might get leadership but that road was destructive. It should be abandoned at one land the foundations laid for a permanent reconciliation. Failing that, the flames would rise higher and in the end we could predict exactly which community would suffer most and count the greater number of corpses …… India Muslims must remember that their forefathers or rather their medieval Coreligionistveminority rulers or India were beastly and frightful to the Hindus (with exception such as Akbar). No Islam sanctioned their conduct. Temples were indeed demolished and their stones often used to construct mosques on the very site.* দেশ ভাগের রক্তাক্ত পটভূমিতে প্ররোচনা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরাষ্ট্রের দাবী ওঠেনি — এখনো সে দাবী নেই বললেই চলে। কিন্তু কে বলতে পারে নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যালঘু ধর্মীয় উগ্রতা, অসহযোগিতা এবং জংগীপনার প্রতিক্রিয়া আগামী দিনে এ দাবীকে অনিবার্য করবে কিনা! সেই পরিস্থিতি কি মুসলিমদের কাছে বাঞ্ছনীয় হবে?

তথ্যসূত্র ঃ

(১) /Sotsializmi reliigiya" in Polnoe sobranie Sochineii Moscow 1960 : Radical Humanist Vol 41 No. 2

(২) Kommunist No. 7 (1953)
(৩) হিন্দু মুসলমানের বিরোধ — কাজী আব্দুল ওদুদ (বিশ্বভারতী প্রকাশনা)
(৪) সেকুলার রাষ্ট্র ঃ সেকুলারিজম ও ধর্ম — 'ভাবনা-চিন্তা' ১লা জুন, ২০০০
(৫) Rediscovery of India – Ansar Hossain Khan (Orient Longman)
(৬) পুরোগামী — জানুয়ারী, ১৯৯০



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com